দাল বাটি চুরমা

মৈত্রেয়ী কুমার

আগুন গরম বালি। ধূ ধূ হাওয়া দিচ্ছে। চোখে নাকে যেন সীসে গলা হলকা লাগে। জল ফোস্কা পড়ে পড়ে পা অসার। মাথা-মুখ লাল, হলুদ, গোলাপী ওড়নায় পেঁচিয়ে ধীরে ধীরে চলছে মেয়েমানুষের দলটা। মাথার বিড়ায় একটা মাটির কলসি তার উপর স্টীলের জালার তিন থাক সাজিয়ে চলেছে ওরা। কাঁটা ঝোপ, উচুঁ নীচু বালির ঢিবি পেরিয়ে চলেছে পথ। এক কুয়াঁ শুকোলে খুঁজে বের করতে হবে আর এক কুয়াঁধার।

ঝুরো ঝুরো বালি হাওয়ায় পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে। রঙ্গীন ওড়নার ফাঁকে চারিদিক নীলী, গুলাবী, কেসরিয়া দেখায়। যদি সত্যি অমন রঙ্গীন স্বপ্নময় হত এই ভুবন! পাথর, কাঁকর, কাঁটা গাছ আর মরুঝড়। এই তো বাস্তব!

গৌরী ওর রঙীন ওড়নার ফাঁকে চামেলীর মুখটা ভালো করে জরীপ করে নেয়। আজ কী হল মেয়েটার! চলতেই পারছে না, ধুঁকছে যেন। কিন্তু তা বলে গৌরীর তো দাঁড়ালে চলে না। ডাগর ভরতেই যদি বেলা চলে যায়, ওদিকে তার মরদ কি ছেড়ে কথা কইবে? বালির হাওয়ায় মিলিয়ে যায় গৌরীর দীর্ঘশ্বাস। হায় রে, কি ভেবেছিল আর কি হল! বেহা, ঘর পরিবার, আঙ্গনভরা শিশু কে না চায়! মরদের দুটো সোহাগ, অবরে সবরে খুচরো কিছু নটখট, মান অভিমান, মান ভাঙা — এই সবই তো হওয়ার কথা বেহাওয়ালী ঔরতের জীবনে। কিন্তু গৌরীর দিন-রাত! ভাবতেও আতঙ্ক চেপে ধরে ওকে।

“থোড়া জলদী চল্! আজ তোর হল কী?”

চামেলী মাথার ঘড়া সামলে বললো, “ক্যা পতা! দিন দাহাড়ে এতো নিদ্ লাগে আজকাল! রাতে কি সব উলট পুলট খোয়াব দেখি। গা গতর বহুৎ ব্যথা!”

শুনে চিন্তা করে গৌরী। “তুই নতুন এসেছিস। জায়গা মানাতে টেইম লাগে।” বলেই থেমে যায় গৌরী। জানে অনজানে চামেলীর কোন ক্ষতে ঘা পড়েছে, সে বোঝে। কথা ঘুরিয়ে বলে, “চল্। কুয়োতে গেলেই কি জল পাবো? হয়তো ওরা আমাদের নিতেই দেবে না আগে। মাজা ধোওয়া আর খাওয়ার জল সবে মাত্র ভরা হয়েছে পরিন্দোয়। এখন আসবো আরও দু’ বার। কাল জিজি বললো, ‘গায় ভৈঁসের পেট ছাড়ে টিউবকলের জলে। ওদের জন্য কুঁয়ার জলই আনিস্।’”

গৌরীর কথাই সত্যি হল। দূর থেকে দেখা যায় উচুঁ উচুঁ খিলান, লোকে যাতে বুঝতে পারে বালিয়াড়ি বুকে কুঁয়া আছে। গ্রামের মেয়ে বৌরা জল ভরতে ব্যস্ত। কেউ বা কুয়োতলাতেই বসে গেছে বিড়ি টানতে। কেউ নিজেদের নতুন বোরলো, বিলিয়া দেখাতে ব্যস্ত। বাদামী মরুর বুকের উপর ফরফরাচ্ছে যেন একদল নীল হলুদ গুলাবী তিতলিয়াঁ।

প্রথম প্রথম এদের সাজ পোষাকের এত রং দেখে অবাক হত গৌরী। তখন তার বয়েসটাই বা কি! বড় বড় নাথানি নাকে, গোটা গোটা বাহু-হাত ভরা চুড়ি পরা ঘাগরা চোলির ঔরত আর গালপাট্টা, কানে গুরদো পরা পুরুষদের হাঁ হয়ে দেখতো। একদিন জোর লাত দিয়ে বাসন মাজার পৈঠোতে ফেলে দিয়েছিল মরদ। “আঁখ ফাড় ফাড়কে পরপুরুষ দেখা? বেশরম! ইয়ে গুজরিগাওঁ হ্যায়। আজ পাথওয়ড়ি ডেকে বলেছে, কাল মুখিয়া সরপঞ্চ বলবে। গাওঁতে আমার ইজ্জত নেই? মালজাদী! লড়কি, পৈসা ঔর খেতি — সমহালকে না রাখা যায় তো লুঠ ছো জায়েগা!”

ন’ বছরের কচি মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল তার গুনাহটা কী। আর এই পাথওয়াড়িটাই বা কে?

সেদিনটার কথা আজও মনের পুকুরে বীজকুড়ি কাটে গৌরীর। উঠোনের একধারে কামলো গায়ে জড়িয়ে সারাদিন চারপাইতে শুয়ে থাকে এক ঔরত। ঘং ঘং কাশে। সেই প্রথম দিন থেকেই দেখেছে গৌরী। নাকে এত্তো বড় ফাঁদা নথ। চুল এলো ঝোলো। হলুদ উড়নীর ঘোমটা। নীল-

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

সবুজ ঘাগরা চোলি। দু' হাতে বাবন সফেদ চুড়িয়াঁ সেই হাত থেকে কাঁধ অব্দি উঠে গেছে। কাজল লেপা নীল নীল মণির চোখ। ওই তার সতীন। এ বাড়ির আসল মালকীন। দিদি সা।

দিদি সা'র নীল চোখে তাকে নিয়ে কৌতুক দেখেছে গৌরী, ঘৃণা দেখেনি। ভাবটা যেন, "কেমন বুঝছিস?" ফি মাসে কুড়ি দিন রক্তপাতে দিদি সা'র সারা শরীর সফেদ। হাঁপায়। পড়ে থাকে চারপাইতে। "তাই তো তোকে আনলো। ওর খিদে মেটাবে পারো দিয়ে!" হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেছিল দিদি সা।

বরের লাত খেয়ে কুয়োঁতলে রাঙা পেতলের ডাগরের কোনা লেগে ঠোঁট কেটে দরদর রক্তে ভেসে গেল চোলি। দিদি সা বললো, "আরে মারারি, এরা খোত্‌লো। জাঠ্‌। পারলে আমাদের এই কামলো দিয়ে ঢেকে রাখে।" বলে চারপাই থেকে নিজের সাদা কালো চৌখুপী রজাই তুলে দেখায় দিদি সা। "তুই দেখিস না, আম ঔরতের চলন বলন? তেমনি চলতে হবে তো! কাল থেকে ঘুঙ্গটের উপর সাদা চাদর লপেটকে বেরোবি। আর ওই শালা এক পাথওয়াড়ি! শালার কাজ কেবল চৌরাহার বেদীতে বসে হাত গোনা, পাঁজি চাখা। সবার পেটের চারাদানার খবরি একটা!"

কুয়াঁধারের কিছু দূরে গৌরী চামেলীর কানে কানে বলে, "আজ আর পানি তোলা হয়েছে! দ্যাখ একবার তাকিয়ে।"

ওদের দেখে হুল্লোড়ে ফেটে পড়ে গ্রামের মেয়ে বৌগুলো। "অরি রি রি, মেহমানরা এসেছে কুণ্ড থেকে পানি নেবে। তোরা আরতি উতার! জাগা খালি কর!" একে অন্যের গায়ে হেসে ঢলে পড়ে মেয়েরা। ওদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, "দীসাবর! মরিলীয়া!" এই রুক্ষ মরুর বুকে হাসি মজাকের খোরাক কমই জোটে। কাজেই মওকা পেলে ছাড়ে কে?

কারোর চোখের ভাষায় অভ্যর্থনা নেই। গৌরীরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পানি তো নিতে হবেই। এর মধ্যে চামেলীর কি হল কে জানে, পাক খেয়ে বালিতে পড়ে গেল মেয়েটা। মহিলাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তারা দূর থেকেই চ্যাঁচাতে লাগলো, "কামীন! মারজানা! কুয়োঁতলায় মরতে এলো? মরতে হয় তো বালিয়াড়ি রেগিস্তানে যা!"

এক বুড়ি চেঁচিয়ে বললো, "আমাদের খেতিতেও বাজরা ফলে রে! মরদগুলোর তাও ভিন্‌ দেশী বাজরায় রুচি!"

গৌরী তখন ওদের কথার হুল শুনবে না চামেলীকে দেখবে বুঝতে না পেরে কুয়োঁপাড়ে এগিয়ে গেল। একটু পানি ছিড়কালে যদি উঠে বসে চামেলী। ঘড়ার লাবে হাত দিতেই এক মর্দাঙ্গী ঔরত এসে হাত চেপে ধরলো। হিসহিসিয়ে বললো, "যতই তোরা দেখাস তোরা বেহাদার ঔরত, আসলে সবাই জানে তোরা কুলটা। পাঁচ হাত ঘোরা, দশ বিস্তরায় শোয়া! তোদের থেকে তো ওই গায় ভৈঁসের জীন্দেগীও অনেক বেহতর। তোর এতো হিম্মত! আমরা গাওঁয়ালি শাদিশুদা ঔরতরা এখনও কুণ্ড ছেড়ে যাইনি, আর তুই লাবুতে হাত দিস!"

"না, মানে, ও তো বেহুঁশ হয়ে গেলো, তাই…" আমতা আমতা করে গৌরী।

"খামোশ!" তড়পে ওঠে মহিলা। "তোকে আমি খুব চিনি। কোত্থেকে এসেছিস বল?" গৌরীকে ধাক্কা দিতে দিতে বলে মহিলা। "বঙ্গাল, না ওড়িয়া তুই?"

মাথা নীচু করে থাকে গৌরী। মনের স্মৃতি পুকুরে অজস্র পানা। কিছু মনে কি আছে যে মুখ খুলে বলবে ওর পরিচয়।

অশেষ দুর্ভোগ ভুগে, কোনো মতে জলের ছিটায় চামেলীকে হুঁশে আনে গৌরী। তিন ঘড়া জল ভরে ঝোপড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বেরিয়ে এল গৌরীর মরদ। আজ ক্ষেতের সব আগাছা সাফ করে , শস্য থেকে কুশ বার করে রাখার কথা ছিল ওর। কুয়োঁতলার তাণ্ডব সেরে ঘরে ফিরতেই বেলা কাবার। আজ জলও কম ভরতে পেরেছে ও। কোন কথা না বলে হিড়হিড় করে হাত বেঁকিয়ে টেনে নিয়ে চললো উঠোনে। মাথার চুলে মোচড় খেতে খেতে ঘাড় বেঁকে গেল গৌরীর। চ্যালাকাঠের উপর্যুপরি সদব্যবহার সেরে ওর মরদ যখন রুটি গিলতে বসলো, তখনও চিৎ হয়ে ধুলোতে পড়ে আছে ও। মাথার ওপর নীল ধোওয়া আকাশ। ওগুলো কী ঘোরে? অতো উচুঁতে? চিল না শকুন!

গৌরী দেখেছে, হাজার মার খেয়ে রক্তাক্ত হলেও দিদি সা একটা বাধা দেয় না। একমনে চারপাইতে বসে গুঁদড়ী বোনে, নয়তো গৌরীরই তুলে আনা মীঞ্জরের ফল দাঁতে কাটে দুলে দুলে।

— "ও হে, বড়মানুষের ছোরি! ওঠ্‌। দশ হাজার টাকায় তোকে খরিদ্দার করেছে আমার মরদ। তোর গতর দিন দাহাড়ে এলো করে শুয়ে থাকার জন্য?" এক সময় বলে ওঠে দিদি সা। "রুটি দে! নিজেও গেল!"

রক্তচক্ষুতে একবার নিজের চারপাই আসীন বৌ-এর দিকে তাকিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যায় ওদের মরদ।

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

খাবার বলতে রুটি, খিরার কাচড়ো আর পেঁয়াজ লঙ্কা। তবু করতে তো হয়। হাতটা এমন চুমড়েছে, এখন কাচাধোওয়া করতে পারলে হয়। রসোইতে উনুনে কাঠ গোবরের চুলা জ্বালাতে জ্বালাতে ভাবে গৌরী, সে তো আখেরে লুঠ হওয়া মাল-ই! যব যব তার জীন্দেগীতে দখলদারদের লুকসান হয়েছে, চোখের পলক ফেলার টাইম পায়নি সে। বেহাত হয়ে গিয়েছে।

তবে সব ঝোপড়িই এক। একবার ঝোপড়িতে মাথা গলালেই হল। কাজের শেষ নেই। সেই কোন মুর্গা ডাকা ভোরে ওঠো। তারপর গায়-ভৈঁসকে চারা-দানা দেও, গোঠাল ধোওয়া পোছা, গোবর কুড়নো। খড়বিচালি দিয়ে গোবর মেখে যতক্ষণে বাইরের দেওয়ালে প্রথম ঘুঁটে মারে গৌরী, সূর্য্য উঁকি দেয় বালিয়াড়ির ফাঁকে। তারপর ঝড়ের মতন উনুন জ্বেলে নাস্তার চা-রুটি করা। জয়সলমের বসঅড্ডাতে ফলের দোকান দেয় মরদ, তার রোটি সবজি টিফিন দেওয়া। জল আনতে যাওয়া। দুপুরে দুটো গিলেই ছোটো মাঠে। মাঠের কাজে কোমর ছিঁড়ে পড়ে। আর ধূপের তমক ধমক থাকলে তো কথাই নেই। খেতির বুকে জলের নল লাগানো। টাইমের হিসেব করে পানির পাম্প না চালালে রোওয়া সর্ষে পুড়ে হবে রাখ।

এখানেও শেষ নয়। দিনের মধ্যে একবার যেতেই হয় ভাঁড়ারে। তবে এখানে আসতে ভালোই লাগে গৌরীর। সারাদিন রোদে পুড়ে ভাজা ভাজা হয়ে কাজ। বালিতে পুড়ে পায়ে যে কত অসংখ্য ফোস্কা তার হিসেব নেই। এই কাদা গোবর লেপা আঁধারি আঁধারি ঘরটাতে ঢুকলেই কাঁচা গোবর, আলকাতরা আর নীমপাতার গন্ধ। বোরি বস্তায় রাখা জোয়ার বাজরা, যব ছতু। দানা শস্য হাত দিয়ে উল্টে পাল্টে আরও বেশ নীমের পাতা ঠেসে ঠেসে দিতে হয়।

সাঁঝ নামে। আকাশে ফুটি ফুটি হয় তারা। তখন আবার চুলা ধরাও, খানা পকাও। তারপর আসে রাত অন্ধকার, অপমান, অত্যাচার আর লাঞ্ছনা নিয়ে। একটা রাত রেহাই মেলে না গৌরীর। নিজের মনপুকুরের পানাগুলো সরিয়ে একটু উঁকি দেবার সময় নেই। তাই ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে কতগুলো দিন-রাতের ছবি। লাল ফিতের বেড়াবিনুনী, এক্কা দোক্কা খেলা, নদীর পাড়ে উচুঁ উচুঁ জমি, নদীর বুকে জাল, জালে মাছ আর সেই মাছ ধরায় কি পটু ছোট্ট একটা মেয়ে। এক একদিন ওই নোনা জলে ঘণ্টা ঘণ্টা চুবে পাঁচশ মাছ ধরা মেয়েটা কবে নিজেই যে জালে ফেঁসে গেল! আধমরা মাছ হয়ে ভেসে গেল এক জাল থেকে আর এক জাল, সেখান থেকে আরও এক জালের ঠাস বুনটে।

এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও কারও মুখে হাসি ফোটাতে পারে না গৌরী। সে দলিদর দীসাবর। গরীব পারো। তার জীবনের মূল্য কী? কুয়োঁপাড়ের ঔরত ঠিকই বলেছে, গায় ভৈঁসও অনেক বেশী সম্মান পায় তাদের থেকে।

“ঘুমোলি না কি?” চারপাই থেকে হাকেঁ দিদি সা। দিনের মধ্যে এই সময়টুকুই যা দু’দণ্ড জিরেন মেলে। মরদ বসঅড্ডার ফল দোকান বন্ধ করে যায় কখনো দোস্ত ঘরে মুভি দেখতে, কখনো সরপঞ্চ আপিস, কখনো চৌরাহার মোড়ে গাওঁয়ের মুখিয়াদের সাথে হুঁকা করতে। এই সময় চরাচর স্তব্ধ হয়ে থাকে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের কুপি জ্বলে। এক একটা ঘর যেন এক একটা রহস্যে মোড়া।

“না, দিদি সা।” তুরন্ত জবাব দেয় গৌরী।

“কি দেখিস?”

“বালুভূমির ওই পাড়ে বহুৎ দূরে পাকিস্তান, না দিদি সা?”

“হাঁ। বডার। মারো গাওঁ ইণ্ডিয়ার শেষ সীমানা।”

হুঃ, গাওঁ বলতে কী, ভাবে গৌরী। গোল গোল ক’টা গোবর মাটির কুঁড়ে। খড়বিচালির চালা, রাস্তার ধুলো ঘরের আঙ্গনে এসে মিশেছে। কাঠের লকড়ি পুঁতে পুঁতে এক ঝোপড়ি থেকে অন্য ঝোপড়ির সীমানা আলাদা করা। না ছিরি, না ছাঁদ! মরদগুলো বেশীর ভাগই খেতি করে। উট দিয়ে জমি উগায়ে। গম যব চারা রোয়। জোয়ার বাজরা সর্ষে করে। শশা ফলায়। আলুও করে কেউ কেউ।

এসব তো বাইরে। ভেতরে ভেতরে এদের চলে আসল লেনদেনের বেওসা। যে বেওসায় বেনোজলের মতন টাকা আসে এদের হাতে। শাদিশুদা বৌ বেচাকেনার বেওসা। গ্রামের যত অপাহীজ, ল্যাংড়া, নাকাম মর্দ আছে, অনেক সময় বেহার জন্য লড়কি পায় না। তারা কি শুখা রোটি তোড়বে? আনাও সরেস মাল জমনার ওপার থেকে — পারোদের। বঙ্গাল, আসাম, ওড়িশা, বিহার থেকে, পারো, মোলকী, মালজাদীগুলো। বেহা রচাবার নাম করে এনে জুতে দাও খেতিতে, আর ঘরের ঝি-গিরিতে। বাড়তি নিজে মজা লোটো, ইয়ার দোস্ত বুলাও। গা শিরশিরিয়ে ওঠে গৌরীর।

“মালিশ তেলটা আন। আজ দু’দিন আমার ব্যথাটা বেড়েছে।” বলে চারপাইতে উপুড় হয়ে দিদি সা। কোমরে তলপেটের ব্যথা দিদি সা’র। গরম ঘানি তেলে লসুন কালাজিরে দিয়ে মালিশ দেয় গৌরী। দিদি সা এক কহানী বিড়বিড়ায় — “হবে না? কম পাপের ভার বয়েছে এই শরীর?”

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

দিদি সা'র বিড়বিড়ে কহানী গাওঁর সবাই জানে। লুকাছাপা তো কিছু নেই। মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে তাকে মরতে হবে, এই তো নিয়ম। হয় মা মারুক নুন গিলিয়ে বা তামাক পাতা খাইয়ে, না পারলে শাশ আছে। সে মাটির হাঁড়িতে বালি ভর্তি করে জ্যান্ত কবর দিয়ে আসবে ওই রেগিস্তানের বুকে। তাও না হয়, মরদরা আছে তো! পাথরে কচি মাথা একবার ঠুকলেই কেল্লা ফতে।

— "এতে শোক কেন আর কান্নাই বা কিসের? কান্নার জল ক্ষেতে গিয়ে ফেল, কাজে দেবে।" বলেছিল দিদি সা'র শাশ। তারপর বুঝিয়েছিল, "লড়কি ঘর আওবে তো হমার দশা ভিখারি জৈসে হওবে। দহেজ দিতে দিতে ফতুর হবো। তাছাড়া লড়কা হলে আসবে বহূ। সে তো তোরই সেবা করবে বুঢ়াপে পর! আচ্ছা নিকম্মা বুদ্ধি-সোচ তো তোর!"

দিদি সা পোয়াতি হলে দু' দুবারই শাশুড়ি ধূমধাম করে পীলাপোত্রা দিল। খুব আশা করেছিল পোতা হবে। শখ ছিল বুঢ়িয়ার ঘটা করে জলবার দেবে। ঘরের দেওয়ালে পড়বে কাঁচা গোবরের স্বস্তিক চিহ্ন। ঘরের উট দুটো নতুন জরির চাঁদোয়া পাবে। গোটা গাওঁ দাবত খাবে। গাওঁর দশটা লোকের সামনে মাথা উঁচা হবে। ঔরত মহল পোতার দাদীকে দুটা ইজ্জত দেবে। "বহূ, তোর বাপু সা সাতটা ট্রাক্টরের বদলে দিলো পাঁচটা। এবার পোতার মুহ্ দেখিয়ে বাপু সা'র কর্জ উতার!"

দেওয়ালে ঝোলানো আদ্যিকালের বজরঙ্গবলীর চরণে যতই মাথা কোটা হোক, সিদূঁর লেপা মুখে আরও সিদূঁরের নতুন পোচ — কিছুই কাম করেনি। ক্রুদ্ধা বৃদ্ধা লাত মেরে ভেঙে ফেলেছিল মাটির উনুন। দুধ উবলাবার বড় ভারি কঢ়াবনী বসানো ছিল তাতে। গরম দুধে পা জ্বলে ঘা হয়ে সঙ্গে গেল বুঢ়িয়া আর মরদের লাঠির বাড়ি শিরদাঁড়ায় পড়ে নিম্নাঙ্গ খুইয়ে চারপাইবাসী হল দিদি সা।

গগনের কালোর ওপারে কোথায় আছে ভগবান তা মুখ উচুঁ করে দেখার চেষ্টা করে গৌরী। আদৌ আছে কি? উনুনে কাঠ ঘুঁটে দিয়ে জাল ধরাতে যাবে, কেমন একটা খস্ খস্ আওয়াজ উঠলো খিড়কিতে। বিছুয়া কি সাঁপ ভেবে লকড়ি হাতে দেখতে গিয়ে দেখে চামেলী। "তুই এখন?" চাপা গলায় বললো গৌরী।

(Photo: Rafal Cichawa/Shutterstock)

ও তড়বড়িয়ে ফিসফিসায়, "কল সূরজ যখন পীপল গাছের মাথায় চড়বে, ঘড়া নিয়ে চলে আসবি মরা তলাবের দিকে। খুব জরুরী বাত আছে গৌরী। এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে এ বাড়িতে।"

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

এমন সময় ওর মরদের রাগী গলায় ‘চমেলী, চমেলী’ হাঁক শুনে চামেলী মুহূর্তের মধ্যে আঁধারে মিশে গেল। কি ব্যাপার বুঝে পেল না গৌরী। মনে অশান্তির কাঁটা নিয়ে চুলা জ্বালিয়ে হাতের চাপড়ে বাজরার রোটি বড় করতে লাগলো।

ফট্ ফট্ ফাটছে কাঠ, পড়্ পড়্ পুড়ছে ঘুঁটে। সাদা সাদা ধোঁয়া বেরোচ্ছে উনুনের মুখে বসানো রান্না থেকে। “আজ দাল বাটি চুরমা কর। তোর হাতে এমন খোলে কি করে রে? শিখলি তো আমার কাছে! গুরু মারা বিদ্যে?” ইদের চাঁদের মতন হাসে দিদি সা।

সেদিন বাইরে থেকে এসে দিদি সা’র চারপাইতে বসলো মরদ। ওদের মধ্যে কথা এই দু’ বছরে দু’বার শুনেছে কি গৌরী! শুধু কানে এল, “লুকসান! লুকসান!” দিদি সা কোনো কথা বললো না। শুনে গেল শুধু।

গৌরী জানে, ‘লুকসান’ শব্দটা যেন কামানের গোলা। মৃত্যুর পরওয়ানা। এর আগে যতবার শুনেছে, ঠাইঁছাড়া হয়েছে। ওর নসীব।

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে গৌরী, ওর বাবারও তো লুকসানই যাচ্ছিল! নইলে ওকে ওর আলপনা দেওয়া এক্কা দোক্কা খেলার ঘর থেকে অমন করে সরিয়ে ফেলতে পারলো বাবা? বাবারও জমি ছিল ধানের। সাগরের নোনা মাটি তো, তাই এক ফসলী আমন ধানই দিতো বাবা। সে আর দুই ভাই মিলে সাতজেলিয়ার মিড ডে মিল ইস্কুলে যেত। মা’র মাথায় তেল পড়তো, পায়ে মোটা আলতা। মা’র কথা মনে পড়লে গৌরীর চোখে আর জল আসে না। রেগিস্তানের ধূ ধূ শুধু চোখে। তবু মনে তো পড়ে!

একদিন মাছের ভেড়িওয়ালা নফর চাচার নজর গেল বাবার ফসলী জমির উপর। তর্ক, অশান্তি ঝগড়া। বাবার জমির ধান নষ্ট হলো তো ভেড়ির মাছ মরলো বিষ খেয়ে। শেষ অবধি বিধাতাই থামালো এই যুযুধান। এক সাঁঝের আঁধারে ভেড়ির উপর থেকে চাচা দেখলো বাবার জমির বাঁধের এক জায়গায় খুব বড় ফাটল ধরেছে। বাবাকে কোনো খবর না দিয়ে চাচা চলে গেল।

পরদিন সকালে গৌরীদের সংসারে সাগরের গ্রাস। জমিহারা বাবা পাগলের মতন এটা ওটা করে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। মাছধরা সবার কর্ম তো নয়। লবণ জলে পাঁচ ছ’ ঘণ্টা পড়ে থেকে থেকে পায়ে হাজা জমে যায়। হাতের চামড়া কুঁচকে ওঠে। বাবা মধু আনার কাজে লাগলো। তাতেও সুবিধা হল না। শেষে হাঁটুর ওপর লজ্জা শরমের কাপড় তুলে মা নামলো নফর চাচার ভেড়ীর কাজে। মাছ ধরার কাজ। সকাল দুপুরে চার পাঁচ ঘণ্টা মশারির জাল পেতে চুবে থাকো জলে। বড় বড় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ভরে উঠতো মাছ। ইস্কুল থেকে ফিরে গৌরীরা তিন ভাইবোন মিলে মা’র সাথে জুটে যেত। বাবা দালালদের থেকে ট্রলি, জাল ভাড়া করে সাগরে যেত মাছের খোঁজে। রাত রাত ভর সাগরে থাকতো বাবা। মা গৌরীর পাশে শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করতো। সকালে মাছ নিয়ে বাবা ফিরলে মায়ের বরফ কঠিন মুখের কয়েকটা রেখা তাও নরম হতো। আর সাগর খালি হাতে ফেরালে নুন-ভাত। তেলটুকুও জুটত না।

ওই সময় একদিন সকালে কোলকাতা থেকে এল বাবার এক বন্ধু, ভানুকাকা। বাবার সাথে অনেক গুজগুজ, ফুসফুস চললো। টিনের বাটিতে চা-মুড়ি খেল। মা গেল মাছ ধরার কাজে। সেও তৈরী হচ্ছে ইস্কুলে যাবে। বাবা হেঁকে বললো, “তোর আজ আর গিয়ে কাজ নেই। তুই এই কাকার বাড়ি গিয়ে ক’দিন থাক, গৌরী। বড্ড লোকসান যাচ্ছে। এট্টু সামলে নিই। তোরে নিয়ে আসবখ’ন।”

“কিন্তু… মা?”

“সে জানে।” বলে বাবা উঠে চলে গেল ঘরে। গৌরী স্পষ্ট দেখলো বাবার মুঠিতে ভরা টাকার বাণ্ডিল।

সেই রাতেই লুঠ হল গৌরীর সারল্য, শিশুত্ব। গৌরী বুঝলো অপনা মাসে হরিণী বৈরী। নিজের গায়ের চামড়াই হরিণের শত্রু। থুতু দিয়ে টাকা গুনে নিয়ে লোকটা একদিন ওকে একটা দলের সাথে ট্রেনে তুলে দিল।

মেওয়াট নাম ছিল শহরটার। পাঁচ ক্লাস অব্দি পড়েছে তো, নামধাম, হিসাব ভালো মনে রাখতে পারে। লোকগুলো আর কিছু ঔরতও ছিল। কি খাটান খাটাতো ওকে। পান থেকে চুন খসলেই মার। মারের চোটে চোখ তলতলে ফুলে বুজে আসতো। খেতে দিত না। একবার পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়েছিল, তিন দিন হাত পা বেঁধে শুধু জল দিয়ে রাখলো।

গৌরীকে পরখ করিয়ে ওই ইয়ারদের একজনকেই বেচে দিল ওরা। গৌরীর নতুন খরিদ্দার। ল্যাংড়া যাদব, ব্রোকারির বেওসা। গৌরী এল অলবার। দূর থেকে দূরে হারিয়ে গেল বাংলার সেই সবুজে সবুজ নারকোল সুপুরি গাছ, গরীবি থাক তবু নিকোনো উঠোন, কোজাগরী পুন্নিমায় দুটো চালবাটা আলপনা, দুটো মোয়া নারুর স্বাদ সবকিছু।

মেওয়াটের জীবন যেন নরকের মতন ছিল। সার সার ঝোপড়ি। কাঁচা নর্দমা, আবর্জনার স্তূপ, আর তার মধ্যে কালো কালো ঝুলে থাকা ন্যাকড়াতানি বাঁধা এক গুহাঘর। পিছনের নর্দমায় শৌচাদি। চানের বালাই নেই রাস্তার কলে জল চলে গেলে। সারাক্ষণ ঘরে চিমসে গন্ধ আর মারধোর, লাথি ঘুঁষি, ফাটা নাক, রক্তাক্ত শিকনী, গালে নোনা জলের শুকনো দাগ। একপেট খিদে আর একগলা তেষ্টা নিয়ে অনন্ত অপেক্ষা। অপেক্ষা ভয়ের, অত্যাচারের। কারণ যা অবশ্যম্ভাবী তা তো উপেক্ষার নয়, তা অপেক্ষার।

 © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

এক সাথে পাঁচ পাঁচটা নরপশু আছড়ে পড়তো ওর শিশু সুলভ নরম দেহে। ঘণ্টা ঘণ্টা ধরে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করতো। ভয়ে গগন বিদারী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এক সময় হুঁশ হারাতো গৌরী।

মরদের মুখে লুকসান শুনে ঘাবড়ে গিয়ে কাঁদাকাটার দিন চলে গেছে তার। দেখতে দেখতে কুড়ি বছর পার। চার বার হাত বদল হয়েছে পারো গৌরী। লোকে ওদের মোলকী বলে ডাকে। ওদের মূল্য আছে। মরদের পকেট ভরে, যৌন লালসা মেটে। কিন্তু ওদের জীবনের মূল্য নেই। শুধু এটাই ভাবে গৌরী — কোথায় পুড়বো? কোন সে জমি? চিতার কাঠে আগুন দেবে কে! একজন তো থাকার দরকার যে কি না তার মরণটাকে অন্ততঃ বেওয়ারিশ কুকুরের মৃত্যুর মতন এক করে ফেলবে না। জীবন তো যেন রেগিস্তানের রেতের মতন দিনগুলোর ফাঁক ফোকরে বেরিয়ে গেল। ধরতেই পারল না। চোখ বুজলে আজও স্বপ্নে আসে মেওয়াটের সেই ভয়ঙ্কর ঝোপড়ি জীবন। আঁধার ঘর, চিমসে গন্ধ আর হাঁড়ভাঙা খাটুনী। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে রাত পার হয়ে দিনের আলো ফুটি ফুটি হলে উঠে পড়ে গৌরী।

মাঠ হয়ে এসে গোঠাল নিকিয়ে, খড় দিয়ে গোবর মেখে ঘুঁটের তাল বানায়। দেওয়ালের গায়ে প্রথম ঘুঁটে দেওয়ার সাথে সাথে বালিয়াড়ি ভেদ করে দিনুনে। চা-রোটি বানিয়ে দিয়ে রসোই ধুয়ে পুছে আজ আগে খেতির কাজ সারতে যায় গোরী। চামেলীর কথা মতন জল কাড়তে যাবে বেলায়।

খেতির বুকে আগাছা জঞ্জাল বাছতে বাছতে দূরে চামেলীর মরদ বীরকে দেখে গৌরী। দুটো বড় বড় বন্দুক হাতে হনহনিয়ে খেতির আলের ধারে মিলিয়ে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে গৌরীর।

পীপল গাছের মাথায় সূরজ চড়লে এক ঝাঁক কুড়জা পাখি উড়ে উড়ে চলে গেল ওই মরা তলাবের দিকে। নিজেকে চাদরে লপেটকে গৌরী ছুটলো বাড়ি থেকে জলঘড়া আনতে।

মরদ তখন সকালের করা রোটি আর ভাজি নিয়ে কাজে বেরোচ্ছে।

“আজ যে তোর বড় কাজের ধূম লেগেছে!” ট্যারা চোখে তাকায় দিদি সা। মাথা নীচু করে ঘুঙ্গট মেরে ধীর পায়ে বেরিয়ে তারপর হনহনিয়ে তলাবের পথ ধরে গৌরী।

হঠাৎ সামনের বাবলা কাঁটার ঝোপ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে চামেলী। এ কী চেহারা হয়েছে ওর মুখের! “আমাকে ওরা আপিম দিচ্ছিল, গৌরী!”

চামেলীর মুখ দেখে মনে হয় ও যেন আগুন থেকে উঠে এসেছে এমন আঁচ। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওকে নিয়ে কাঁটা ঝোপের আড়ালে ঢোকে গৌরী। হু হু করে কেঁদে ওঠে চামেলী। নিজের বুকে ঘা মেরে মেরে কাঁদে। “এ কি! লাগবে যে রে!” চামেলীকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখে গৌরী।

“আমি ক’ মাস ধরে অনাব শনাব খোয়াব দেখছিলাম। শরম কি মারে কাউকে বলিনি। মাকেও না। কিছু বললে মা বলবে, আমরা বিষনোঈ। আমাদের প্রাণ যাবে, ইজ্জত যাবে না। বেহা করিয়ে দিয়েছি মানে অব্ তু পরায়া ধন। অপনা ঘরবার সম্হালিও। কিসের ইজ্জত, বল গৌরী? আমি এক মাস ধরে দিন দাহাড়ে যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছি। তোর সাথে জল আনতে যেতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। এদিকে বাড়ি থেকে বেরোবো সে উপায়ও তো নেই। তোর সাথে সেদিন কথা বলতে দেখে ফেলেছিল বীরজীর ভাতিজা। আমাকে খুব দাবড়ানি দেওয়া হল। মনে কেমন সন্দেহ হল পরসোঁ রাতে আমার লোটায় বীরজীকে পানি না খেতে দেখে। আমিও ওই জল খেলাম না। পরদিন শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে কিছু খেলাম না। দেখলাম বরং ভালো আছি। ছোটুকে দশ টাকা দিয়ে জানলাম ওরা আমাকে আপিম দেয়। ছোটু বলল, ‘তোর ঘরে রাতে সবাই যায়। আমার বাপু সা, কাকা সা সব্বাই।’ আমি স্বপ্নে দেখতাম এক গোছা লোক নড়ছে চড়ছে, উঠছে নামছে। আমি যা স্বপ্ন ভেবেছিলাম, তা তো সত্যি হল রে, গৌরী! এরা শেয়াল শকুনের মতন ছিঁড়ে খেলো আমাকে। এখন আমার সন্তানের বাপ কে হবে, তুই বলে দে!”

চামেলী কাঁটা ঝোপের মাঝে উঠে দাঁড়ায়। চোখের ধ্যাবড়ানো কাজলে ওকে প্রেতিনীর মতন লাগে। ও বলে, “ওই খেতির মাঝে বীরজীর ভাইরা মিলে কবর খুঁড়ছে ওদের একমাত্র বেহনোইয়ের লাশ পুঁতবে বলে।” শুনে আঁতকে ওঠে গৌরী — “সে কী! কেন?”

“বেহনোই গত এক বছর ধরে খেতি জমির বরাবর হিস্সা চাইছে যে!” চামেলী চোখ মোছে। শক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায়। “শোন গৌরী, আমি যখন থেকে জানতে পেরেছি আমাতে আর কামীন রাঢ়ে কোনো তফাত নেই, আমি ঠিক করেছি বীরজীদের বংশ আমি ছারখার করে দেবো।”

তারপর গৌরীর পেটের উপর নিজের হাত রাখে চামেলী। “তোর আবার এঁটোপাতা হয়ে উড়ে যাওয়ার দিন আসছে মারারি। তোর মরদ বীরজীকে জমি খেতির বদলে কত রোকড়া পাওয়া যাবে তার হিসাব কিতাব করেছে। তুই জানিস, তোর মরদের কি বেওসা?”

গৌরী কোনোমতে বলে, “বস অড্ডার ফল দোকান।”

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

“তুই অন্ধকারের জীব হয়ে আর কতকাল কাটাবি?” ফুঁসে ওঠে চামেলী। “শোন গৌরী, এই তীজের পরে তুই আবার পাচার হয়ে যাবি। আমি শুনেছি। এই বেলা ঘুম ভেঙে ওঠ! জীন্দেগী শুধু পেট খালাস আর পোয়াতি হওয়ার রুদালী নয়। তোর ইচ্ছে করে না, এমন একটা জায়গা, যার আঙ্গনে পীপলের ছায়া, আর সেই ছায়ার নীচে তোর শান্তির কবর? তোর সন্তানের হাতে মুখের আগুন! সারা জীবন প্রেতিনীর মতন ঘোরা আত্মাটায় শেষ অবধি একটু শান্তির পানি!”

“কিন্তু আমার কি ক্ষমতা, চামেলী?”

থমকানো গৌরীর হাতে একমুঠো জীবন তুলে দেয় চামেলী। “এই নে, ধর। এরাই রাস্তা দেখাবে তোকে। এবার আর জড়িবুটিগুলো গিলিস না। সন্তানকে আন গৌরী। লড়কা হো য়া লড়কি, তোর মুক্তি আনবে সে। এই নরকের ফাটক খুলে যাবে।”

মেয়েদের আবার মুক্তি কী, হক্ কী? দো ওয়ক্ত কী রোটি-অচার, লহেঙ্গা-চোলি, কিছু জেওবর, ব্যস! হাঁ, বিয়োতে যদি পারিস গোটা গোটা ছেলে, তাহলে ইজ্জত কিছু পাওয়া যাবে। হায়, পোয়াতি উটের মেয়ে হলে এরা ঘরে ঘরে গুড় বাঁটে। আর মানুষের মেয়ে হলে আছড়ে মেরে ফেলে! সরকার থেকে না কি আজকাল রুপিয়া দেয়। রুপিয়া এল এক হাত আর মেয়েও গায়েব হল আর এক হাত!

বিকাল বেলায় আঙিনার বেড়ায় ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে দিদি সা’কে ধরে নামায় গৌরী। সেদিনের রাতের পর থেকে দিদি সা কেমন যেন চুপ হয়ে গেছে। খায় দায় না। খালি ভোরের মাঠ পাখারটুকু ব্যস। এখন রোদ ঘুরে গেছে। দিদি সা’র বেশী তাপ সহ্য হয় না। ওর হাতে ভারা দিয়ে নামে দিদি সা। তারপর হঠাৎ বলে, “আমার জিন্দেগী পুরো খোঁখলা হয়ে গেছে রে পারো! আমার কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই আর। খুন নেই, তাকতও নেই। তুই আমার জন্য এই দো সাল অনেক করেছিস। তোকে একটা সলাহ্ দিই। জানিস তো, পারোদের কোনো কবর হয় না। কারণ তোরা তো ঝড়ের মুখে আটবরা। এঁটো পাতা। তাই বলছি, এবার ঝড়কে পল্লুতে বেঁধে ফেল।”

দিদি সা’কে শুইয়ে দেয় গৌরী। আজ তিন দিন রাত্তির হলে জ্বর আসে। দিদি সা গুনগুনায় — “তুই বোস একটু। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।”

গৌরী প্রমাদ গোনে। কখনো কখনো মরদ দোপহরে আসে। রোটি রাখতেই হয়। আসুক! গর্জে ওঠে দিদি সা। তারপর উদাস হয়ে বলে, “জোরু, রুপিয়া আর খানা — এই তিন চীজের উপর এদের অধিকার! বেহা হয়ে এসে ইস্তক কত গুম খুন দেখলাম। কত আছাড়ি পিছাড়ি জেনানা মায়েদের রুদালিতে ভরে উঠল রেগিস্তান। তোরা পারো। জমনার উস্ পার থেকে আসিস, তাই পারো। তোদের আমরা ঘেন্না করি। ভাবি তোরা পরায়া কামীন, আর আমরা ইজ্জতদার গাওঁয়ালী, শাদিশুদা ঔরত। এ গাওঁতে এক পুরুষের বিস্তরায় জীন্দেগী কাটিয়েছে, এমন একজন ঔরত ধরে আনবি? আমি তার পা কুঁয়োর গাগরের জলে ধুয়ে দেবো।… আমি ছেলে বিয়োতে পারিনি, তাই উটেরও আমার থেকে জেওবর বেশী রে!”

শুনে হেসে ফেললো গৌরী। দিদি সাও বেশ হাসলো খানিকটা। তারপর বলল, “এই যে তুই, কতবার পেট খালাস করলি এই নিয়ে। আর কেন? এবার মরুঝড়ের মোড় ফিরিয়ে দে!”

“আমার কি ক্ষমতা, দিদি সা?” গৌরী শুধোয়। তার ভয় লাগে। দিদি সা আজ জ্বরের ঘোরে উল্টো পাল্টা বকছে বটে, আবার গৌরী মন খুলে কিছু বললে মরদকে লাগিয়ে মার না খাওয়ায়।

মনের অঙ্গনে বড় অযত্নে এই রেত ধুলো মরুঝড়ের মধ্যেও একটা সবুজ চারা ফুটে উঠছে দিন দিন। আধো বুলি ফুটছে মুখে। আলতো আধো হাসি। নরম নরম গা, হাত, পা। চাঁদনীর পবিত্রতায় ঢালা। কোনো গন্দেগী নেই ওর আগমনে।

লেখাপড়া বেশী করেনি গৌরী, তবু বোঝে, জ্বলে পোড়ে শুধু মন। মনেই সব। মনেই বদ্ধতা, মনেই মৃত্যু, আবার মনেই মুক্তি। মরুঝড় উঠল বলে আবার। নাঃ, মনকে শক্ত শেকলে বেঁধে নিচ্ছে গৌরী। এঁটো পাতা হয়ে উড়তে চাইছে না আর মন। মুক্তি চাইছে এই রেগিস্তানের বালুর হলুদ আভায়। দিদি সা’র কঙ্কালসার চেহারা বওয়া ওই চারপাইটার রশিতে রশিতে। ওই ঝকঝকে কাঁসা পিতলের বাসন সাজানো রসোইঘরে। ওই পীপলের ছায়া ঢাকা নীম গোবরের গন্ধ মাখা কোঠালিওতে। এখানেই, এখানেই, আর কোথাও নয়, হে মৃত্যু, তুমি এসো এখানেই। নিজের উচুঁ পেটে হাত বোলায় গৌরী।

আঙ্গন ভরে চাঁদ উঠেছে আজ। বালিয়াড়ি মরুর বুক ধুয়ে যাচ্ছে আলোয়। কি নরম শান্ত ভাব। কোথায় মোর ডাকল কঁ কঁ কঁ। উনুনের আগুন জ্বলছে। কাঠ পুড়ছে, ফরফর ফুলকি ফুটছে। পাকছে দাল বাটি চুরমা।

সারা আঙ্গন ঘি-এর গন্ধে চনমনে। কাঁসার বড় থালায় মরদকে বেড়ে দেয় দাল বাটি চুরমা। সাথে শুখা লাল মির্চ ঝুটি উচুঁ করে গর্বে মাথা তুলে আছে। রঙে গন্ধে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে একেবারে। মরদ খাচ্ছে মন ভরে। খেতে খেতেই বলছে “তোর কঠ মহিনা?”

নির্বিবাদে গৌরী বলে, “দো।”

 © 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

“সামনের মাসে অসপাতালে নিয়ে যাব একবার।” গৌরী বোঝে মৃত্যুর পরওয়ানা অথবা জীবনের পরছি কাটতে তাকে চেপে বসতে হবে ওর মরদের আদুরে যত্নে লালিত ওই উটের গাড়িতে।

“এমন বঢ়িয়া দালবাটির সোয়াদ আগে খাইনি তো!” মরদ ঠোসে। বাঁ হাতের মুঠো উনুনের আড়ালে খুলে দেখে গৌরী। বিষফল ধুতরার শেষ কটা দানার ছিলকা এখনও লেগে আছে হাতে। মরদকে খুইয়ে বেওয়ার সাজে নিজেকে পাগলা গারদ বা জেল গারদে কল্পনা করেও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় গৌরী। জরুরতে সে পাগলা গারদে তার সন্তানকে নতুন জীবন দেবে তাও ভালো, কিন্তু এঁটো পাতা হয়ে আর সে উড়বে না মরুঝড়ের বাতাসে।

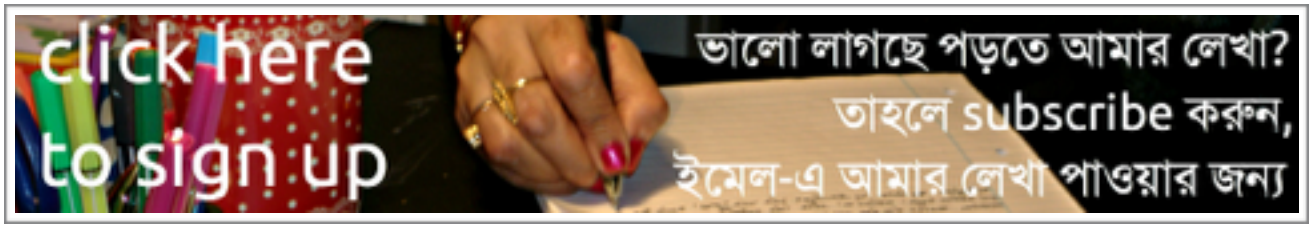

Click here to sign up

© 2016 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com